# আমি স্বাধীনতা দেখেছি!

হারুন রশীদ আজাদ

১৯৬৯'র ১৩ই ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে জনসভা থেকে "জেলের তালা ভাংগবো শেখ মুজিবকে আনবো", "জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো" স্লোগান দিয়ে নাজিমুদ্দিন রোডের জেলখানা গেট অবরোধের জন্য মিছিল নিয়ে রওয়ানা হতেই সচিবালয়ের পাশে (জিপিও 'র বিপরিতে) রির্জাভ ফোর্স মিছিলে বাধা দেয়। তবে সর্ষস্ত্র বাহিনীর লোকেরা মিছিলের অগ্রভাবে মাওলানা ভাষানীর ধাক্কা খেয়ে পথ ছাড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু সচিবালয়ের সামন দিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তারা কাদুঁনে গ্যাস ছোড়ে। এরপর বুলেটের শব্দে শোনা যায়। আমি আর আমার ছোটভাই মিল্লাত, দৌড়ে পীর জঙ্গীমাজার মসজিদে আশ্রয় নেই। অবস্থা খারাপ দেখে কিশোর ভাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরি।

বাসায় ফিরে রেডিওর সংবাদে জানতে পারি শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেয়া হবে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে, ২২শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়। মহান নেতা মুক্তিলাভ করে সরাসরি কারাগার থেকে শহীদ মিনারে চলে যান। চারিদিক লোকে লোকরন্য। সেখানেই আমি প্রথম দেখি মহান নেতাকে। ২৩শে মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সর্মধনায় শেখ মুজিবুর রহমান "বঙ্গবন্ধু" উপাধীতে ভুষিত হন। সেদিনের সেই ঐতিহাসিক মুহুর্তে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পরদিন পত্রিকার শীর্ষ সংবাদে তার নাম লেখা হয়েছিল "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"।

এরপর মহান নেতা সারা বাংলাদেশ প্রাক নির্বাচনী সফরে বের হন। জেঃ ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের ১৯৬৬ সালের ৬দফা দাবীর ভিত্তিতে একটি নির্বাচনি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী করে নির্বাচন দেন। ১৯৭০'র ১২ই ডিসেম্বর সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিক গনরায় অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানে শুধু ১টি আসন ছাড়া বাকি সব আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। মুসলীম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, ইয়াহিয়া পাকিস্ত্মান ডেমোক্রেটিক লীগ সহ সব দলই জনগনের সর্মথন থেকে বঞ্চিত হয়। সেদিন অনেক শীর্ষ নেতার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। নির্বাচনের ফলাফল জেনে ইয়াহিয়ার ইসলামাবাদ সরকার দিশেহারা হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। ঢাকা হবে রাজধানী! কুটনৈতিক মিশনগুলি ঢাকায় আসবে! জাতিয় সংসদ থাকবে ঢাকায়! ইসলামাবাদ, করাচির কি হবে!

১৯৭১'র শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ সামরিক শাসকদের চাপে রাখতে মিছিল মিটিংয়ে সরগম রাখে রাজপথ। দেশের অবস্থা দিন দিন উত্তপ্ত হতে থাকে। এমতাবস্থায় জেঃ ইয়াহিয়া ১লা মার্চ ভাষন দিয়ে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করলে বাঙ্গালীজাতি আইন অমান্য আন্দোলনে নেমে পরে। সারাদেশ তখন ধর্মঘটে অচল। ইয়াহিয়াহিয়ার ভাষনের সারর্মম বুঝে বঙ্গবন্ধু ৩'রা মার্চ মতিঝিলস্থ হোটেল পুর্বাণীতে পার্লামেন্টারি কমিটির রুদ্ধদার বৈঠক করে স্বাধীনতার রুপরেখা তৈরী করেন। সভা শেষে হোটেল কক্ষ থেকে বেড়িয়ে সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন আমার যা বলার ৭ই মার্চ সহরাওয়ার্দী উদ্দ্যানে ( তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান ) বলবো। আমি খুশীতে সন্ধ্যর আগেই ঘরে ফিরে বাবাকে বললাম ৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষনা করবেন। বাবা বললেন, না এভাবে স্বাধীনতা ঘোষনা দেওয়া যায় না, পাকিস্ত্মানিরা তাহলে তাকে সেখানেই হত্যা করবে। শেখ সাহেব নিরস্ত্র জননেতা।

পাকিস্তানীদের যুদ্ধ না করে সড়ানো যাবেনা। আমি সে দিন বাবার সে কথা বিশ্বাস করিনি। ৭ই মার্চ সকাল সকাল সহরাওয়ার্দী উদ্দ্যানে হাজির হয়ে অবাক হলাম! এত মানুষ কোথা থেকে এলো! চা, লাঠি বিস্কুট, চিনাবাদাম, আর ঝালমুরিতে সকালের নাস্তা, দুপুরের ভোজন সবই সারলাম। বিকালে নেতা আসলেন। ভাষন দিলেন। সরকারি কর্মচারি, কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন। ঘরে ঘরে দুর্গ আর নীজ নীজ এলাকায় সেচ্ছা সেবক বাহিনী গড়ার নির্দেশ দিলেন। পরদিন থেকে ৩২ নং ধানমন্ডির বাড়ীটি অঘোষিত রাষ্ট্রপতি ভবণ হয়ে উঠল! সেনা নিবাস ছাড়া অন্য সব শাসন প্রশাসন চলতে লাগল আওয়ামী লীগ প্রধান তথা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে।

ইয়াহিয়া গোপনে দেশের প্রতিটি সামরিক ছাউনিতে নির্দেশ পাঠায় - আর সময় দেয়া যাবে না। সুযোগ বুঝে বাঙালি নিধন কর্মসূচি 'অপারেশন সার্চলাইট' বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। ক্রুদ্ধ ইয়াহিয়া-টিক্কারা গোপন বৈঠক করে প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টেও অপারেশন শুরু করার নির্দেশ জারি করে। গোপনে তারা যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের নেতা সঙ্গে। অন্যদিকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব নিয়ে ১৫ই মার্চ ঢাকায় আসেন তিনি। আলোচনা চলে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত। তবে ২৩শে মার্চ পাকিস্ত্মান দিবসে সারা দেশে সরকারি ও বেসরকারি ভবনে পাকিস্ত্মানি পতাকার পরিবর্তে মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়। ৩২নং ধানমন্ডির ঐতিহাসিক বাড়ীটিতে বঙ্গবন্ধু হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে জেঃ ইয়াহিয়াকে জানিয়েদেন বাংলার মাটিতে পাকিস্ত্মানের কবর রচিত হল। বাড়ীর দোতলার ব্যালকোনিতে পতাকা উড়িয়ে শিল্পী আব্দুল জাববারকে নিচে হারোমনিয়াম গলায় ঝুলানো দেখে বললেন ভাল একখানা গান শোনা। আমি তখন আব্দুল জাববাররে পাশে ছিলাম ।

অন্যদিকে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র রাজাকার-আলবদর বাহিনী গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণের পাশাপাশি দেশজুড়ে প্রচারণা চালাতে থাকে - ভারতীয় হিন্দুবাদীরা ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করতেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুশমনি শুরু করেছে। আর আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ওই ষড়যন্ত্রের হোতা হিসেবে দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। ২৩শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ ও ড. কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এদিকে পাকিস্তানের সেনা গোয়েন্দা দফতর থেকে ঢাকা শহরের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা, পুরনো ঢাকার বিভিন্ন এলাকা, মিরপুর, সৈয়দপুর ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক এবং বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা চালানো হয়। বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর গুলিতে বহু লোক নিহত হয় এবং ব্যাপক লুটতরাজ ঘটে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ সেনাবাহিনীর এই গুলি, নৃশংস হত্যা ও লুটপাটের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

এদিন বিকালে অন্যান্য দিনের মতোই হাজার হাজার মানুষের মিছিল গিয়ে সমবেত হয় স্বাধীনতার সূতিকাগার বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর রোডের বাসভবনের সামনে। শ্লোগানে শ্লেগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা । বঙ্গবন্ধু বাসভবনের বাইরে এসে জনতার উদ্দেশে বলেন, 'আমার মাথা কেনার ক্ষমতা কারও নাই। আমি বাংলার মানুষের সঙ্গে, বাঙালির রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করতে পারব না।' তিনি সংগ্রামী জনতাকে ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমি কঠোরতর সংগ্রামের

নির্দেশ দেয়ার জন্য বেঁচে থাকব কিনা জানি না, দাবি আদায়ের জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন– এটাই আমার নির্দেশ।

সেদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্দেশ মত অনুষ্ঠান প্রচারে সম্মত না হবার কারনে ঢাকা টেলিভিশনের সব বাঙালি শিল্পী-কলাকুশলী কর্মস্থল ত্যাগ করেন। সন্ধ্যা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা টিভির সম্প্রচারও বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সদর দফতর যশোরে বাঙালি অফিসাররা সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা উত্তোলন করেন। রাইফেলসের জওয়ানরা 'জয় বাংলা-বাংলার জয়'– এই গান গাইতে গাইতে ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং তারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার প্রতি পূর্ণ সামরিক কায়দায় গার্ড অব অনার জানিয়ে ফ্ল্যাগ স্যালুট করেন। ২০ শে মার্চ ঢাকার সাভারের সেনা কমান্ড নিয়ে মেজর সফিউল্লার অনুগতদের সাথে পাকিস্ত্মানি ও তাদের অনুগতদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়।

২৫শে মার্চ আলোচনার কোন অগ্রগতির সংবাদ নাই জেনে সারা রাজধানীতে স্থবিরতা লক্ষ করা যায়! রাত বাড়তে থাকে, সেই সাথে পাক সেনাদের রাস্তায় চলা চলও বাড়তে থাকে। ২৫শে মার্চের জিরো আওয়ারে ঢাকা কেঁপে উঠে বিকট শব্দে! আমি সদরঘাটের অপর প্রান্তে কালীগঞ্জ থেকে দোতলার ছাদে উঠে দেখি ঢাকা অন্ধকার। যে সব স্থানে পাক বাহিনী আক্রমন চালাচ্ছে সেইসব এলাকায় ফ্লেয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই আলো ভেদকরে রকমারি রংয়ের গুলির অগ্নি ছটা বৃষ্টির মত শহরের এদিক সেদিক উড়ে যেতে দেখেছি। ভোর ৫টা থেকে ১০টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করলে ২৬শে মার্চ সকালে ঢাকার চতুর দিকে লক্ষ লক্ষ মানুষর ঢল নামে। আমরা যারা স্বেচ্ছা সেবক ছিলাম তারা জরুরী ভাবে ঠিক করি ঘরছাড়া মানুষদের জন্য খাবার আর শিশুদের জন্য দুধে ব্যবস্থা করবো। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি সে দায়িত্ব পালন করেছি। সেদিন যারা বিনিদ্র রজনীতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নীড়হারা মানুষের জন্য কিছু করতে পেরেছিলো তাদের কাছে স্বাধীনতা দিবসের উপলব্ধিটা অনেক গভীর।

সিডনী ২৫/৩/২০১১